MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র : সেপ্টেম্বর ২০১৯ : দাম-দশ টাকা

ডেঙ্গু মহামারি দমনে ব্যর্থতার দায়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মেয়রদের পদত্যাগ ও কার্যকর ওষুধ প্রয়োগের দাবি পৃষ্ঠা-০৪
পৃষ্ঠা-০৪ নারী-শিশু ধর্ষক-নিপীড়ক-হত্যাকারীদে দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

Website : www.vanguardonline.info Party Website : www.spb.org.bd /Socialist-Party-of-Bangladesh

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর : ভূ-নরকে পরিণত হওয়ার শেষ ধাপে!

৩৭০ ধারা বাতিল এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

[কাশ্মীর জ্বলছে, ক্ষেভে-অপমানে, প্রতারিত হওয়ার যন্ত্রণায় জনগণ কাতরাচ্ছে। সারাবিশ্বের নজর এখন কাশ্মীরের দিকে। এর শুরু কীভাবে এবং শেষ কোথায়? তা জানার প্রয়োজনে কাশ্মীর সমস্যার উদ্ভব, সমস্যার প্রকৃতি, ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কাশ্মীরী জনগণের আন্দোলন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিত্র এই লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।–সম্পাদক]

ভারতের বিজেপি সরকার জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জন্য ভারতীয় সংবিধানের বিশেষ অধিকার সম্বলিত ধারা ৩৭০ এবং ৩৫ (ক) গত ৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে বাতিল করে দিয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় জম্মু-কাশ্মীরের ভারতের অন্তর্ভুক্তির শর্ত হিসাবে এই ধারা ভারতের সংবিধান রচনাকালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই ধারা অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের কতগুলো বিষয়ে স্বাধিকার সংরক্ষিত ছিল। এই ধারা রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে বাতিলের পর রাজ্যের সমস্ত মানুষকে ঘরে বন্দি করে রেখে, সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের গৃহবন্দী করে। ৪৩ হাজার সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন করে, জনসমাবেশ-সভা-মিছিল করার অধিকার বাতিল করতে ১৪৪ ধারা জারি করে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে যুদ্ধপরিস্থিতি ও সার্বক্ষণিক ভীতিকর পরিস্থিতিতে নিয়ে গিয়ে প্রথমে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং পরেরদিন নিম্নকক্ষ লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য পুনর্গঠন বিল পেশ করেন এবং উভয়কক্ষ তা অনুমোদন করে। এই বিলে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের পরিবর্তে দুইটি পৃথক কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল করার প্রস্তাব করা হয়–একটি জম্মু-কাশ্মীর, অন্যটি লাদাখ। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এই দুইয়ের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা থাকবে কিন্তু লাদাখে কোন নির্বাচিত বিধানসভা থাকবে না, সরাসরি দিল্লি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নরের দ্বারা শাসিত হবে। অর্থাৎ, এই বিল আইনে পরিণত হলে জম্মু-কাশ্মীরের অবস্থান বিশেষ মর্যাদার স্থানচ্যুত তো হবেই, অন্য রাজ্যের অবস্থানেরও নিচে চলে যাবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব বা স্বরাষ্ট্র দপ্তর থাকবে গভর্নরের হাতে। ভারতে বিজেপি সরকার যেহেতু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে আছে তাদের পক্ষে এই বিল অনুমোদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার এমনিতেই অসুবিধা ছিল না, উপরন্তু বিজেপিবিরোধী অন্য কয়েকটি দলও এই বিলকে সমর্থন করায় প্রায় বিনা বাঁধায় এই বিল গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ভারতভুক্তির সময় কাশ্মীরের জনগণকে যে স্বাধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল তার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাকেও শেষ করে দেওয়া হলো।

কাশ্মীর ভূখণ্ডের রাজনৈতিক মানচিত্র

রাজা হরি সিং-এর সময়ের যে জম্মু-কাশ্মীরের মানচিত্র এবং যে ভূখণ্ডকে নিয়ে শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খা বাস্তবরূপ নিয়েছিল তা আজ তিনটি শক্তিধর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রানাধীন। এক. পাকিস্তান, দুই. ভারতবর্ষ এবং তিন. চিন। পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রাধীন অংশ : পূর্বতন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের এক বড় অংশ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে, যা আবার দুইভাগে ভাগ হয়ে আছে। একটি ক্ষুদ অংশ যা আজাদ-কাশ্মীর নামে পরিচিত, অন্য বৃহত্তর অংশটি হলো গিলগিট-বালটিস্তান। গিলগিট-বাল্টিস্তান অঞ্চলের মানুষের মতামত ছাড়াই বহুদিন আগেই এই অংশকে জম্মু-কাশ্মীর থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে ফেলা হয়েছে। ৭২ হাজার

৪৯৬ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই ভূমিখণ্ডে মানুষের সংখ্যা ১৯ লাখ। 'বালোয়ারিস্তান ন্যাশনাল মুভমেন্ট'-এর বক্তব্য অনুযায়ী "বিংশ শতাব্দীতেও এই ভূমিখণ্ডকে বলা হতো গিলগিট-বালটিস্তান এবং গিলগিট এজেন্সি। ৭০ এর দশকে পাকিস্তানি দখলদাররা অত্যন্ত চতুরতার সাথে এবং পরিকল্পিতভাবে তথ্যকে বিকৃত করে হীন উদ্দেশ্যে একে 'নর্দান এরিয়াস' বলে নতুনভাবে নামকরণ করে।" (সাফাকাত ইনকিলাবি, পৃ-১৮৫) জম্মু-কাশ্মীরের এই অঞ্চল হলো দুর্মূল্য খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। ১৯৯৫ সালে AUAID Ges PMDC যৌথভাবে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যেখান থেকে জানা যায় যে এই অঞ্চলে ১৪৮০টি সোনার খনি রয়েছে, যার মধ্যে ১২৩টিতে আকরিক সোনার পরিমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়েও বহুগুণ বেশি। এর সাথে এই অঞ্চল রূপা, তামা, সিসা, কোবাল্ট, জিঙ্ক, নিকেল এবং বিসমাথের অফুরন্ত ভান্ডার। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষ সবচেয়ে দরিদ্র, শিক্ষার হার মাত্র শতকরা ১৪ এবং নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা মাত্র ৩.৫। (সাফাকাত ইনকিলাবি, পৃ-১৮৬)

UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization) নামে যে বিশ্বসংস্থা আছে, যাদের হেডকোয়াটার হলো ব্রাসেলস, তাদের রিপোর্ট মোতাবেক ২০০৯ সালে পাকিস্তান মন্ত্রীসভা Gilgit-Baltistan Empowerment and Self Governance Order, (গিলগিট বালটিস্তান ক্ষমতায়ন এবং স্বায়ত্বশাসন আদেশ) ২০০৯ আইন পাশ করে। এই আইন অনুযায়ী দুইটি সংস্থা তৈরি হয় এই অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালনার জন্য। প্রথমটি গিলগিট-বালটিস্তান লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি (GBLA), দ্বিতীয় গিলগিট-বালটিস্তান কাউন্সিল। UNPO ভাষ্য অনুযায়ী দুটোই বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 'fraudulent' সংস্থা। প্রথমটি নামে লেজিসলেটিভ হলেও এদের আইন পাশ করার কোন অধিকার নেই। অন্য যে সমস্ত বিষয়ে তাঁরা প্রস্তাব পাশ করেন তা জমা দিত ইসলামাবাদে এই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীর দপ্তরে। সেই মিনিস্ট্রির সম্মতি থাকলেই কেবল তা কার্যকর হয়। আর কাউন্সিলে ৬ জন সদস্য মনোনীত হয়ে আসেন এই LA থেকে, ৬ জনকে মনোনয়ন দেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, যিনি নিজে এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান।

পাকিস্তানের অংশে একটি ক্ষুদ্র অংশ (১৩ হাজার ২৯৭ বর্গকিলোমিটার), আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত। পাকিস্তান রাজনৈতিক কারণে তাকে 'আজাদ কাশ্মীর' বলে উল্লেখ করলেও সেখানকার প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা এমন যে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হয় ইসলামাবাদ থেকে। পাকিস্তানের পত্রিকা *ডন* এর ভাষ্য হলো–'সংবিধানগতভাবে আজাদ কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ নয়। কিন্তু এটা স্বাধীন রাষ্ট্রও নয়। বিগত ৬২ বছর ধরেই এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্ব পাকিস্তানের উপর নির্ভর করে আছে। ... কিন্তু, প্রকৃত অর্থে, মুজফরাবাদ ইসলামাবাদের ছত্রছায়ায় বাস করে। '(১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০) ICG (International Crisis Group) মনে করে AJK কাউন্সিল দেখে মনে হয় যেন অনেক ক্ষমতা, কার্যক্ষেত্রে তা কিছু নেই, কারণ সামরিক বাহিনী সমস্ত অঞ্চলের উপর প্রায় নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী।' (Report, p-19-20)

চীনের নিয়ন্ত্রণাধীন অংশে আছে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের দুইটি অংশ। প্রথম অংশটি ৩৭ হাজার ২৪৪ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল যা আকসাই চীন নামে পরিচিত। দ্বিতীয় অংশটি গিলগিট-বালটিস্তানের অংশ বিশেষ যা ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান চীনকে দিয়ে দেয়। যেহেতু গিলগিট আইনত পাকিস্তানের অংশ নয়, সেইহেতু সেই অঞ্চলের মানুষের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ভূখণ্ড তৃতীয় কোন দেশকে দিয়ে দেওয়া বিধিসম্মত হতে পারে না।

এরপর হলো ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বতন জম্মু-কাশ্মীরের অংশ। ভারতের সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের কারণেই নতুন করে কাশ্মীর প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারত যদিও বলার চেষ্টা করছে যে এই ধারা বাতিল তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়, তবু এর প্রতিক্রিয়া যে সমগ্র এশিয়া অঞ্চলের রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে তুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের অন্তর্গত যে কাশ্মীর তার মূলত তিনটে ভাগ এক. কাশ্মীর উপত্যকা যেখানে ৯৭ শতাংশ অধিবাসী মুসলিম এবং ৩ শতাংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। জম্মু-কাশ্মীরের মোট ভূমিখণ্ডের মাত্র ১৫.৭ শতাংশ হলো এই উপত্যকা যেখানে জম্মু-কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ মানুষ বাস করেন। দ্বিতীয় অংশ হলো জম্মু, যা দিল্লি ও হিমাচলের সংলগ্ন সমতলভূমি। মোট ভূমিখণ্ডের প্রায় ২৬ শতাংশের এই অঞ্চলে বাস করেন রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ মানুষ। যার মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশ মুসলিম এবং বাকি অংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। তৃতীয় অংশ লাদাখ। মোট ভূমিখণ্ডে বৃহত্তর অংশ হচ্ছে এই অঞ্চল–৫৮.৩ শতাংশ, কিন্তু রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.২ শতাংশ এখানে বাস করেন। এই অঞ্চলের বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ।

কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের সূচনা

১৮৪৬ সালে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে জম্মু-কাশ্মীরের অঞ্চল অধিকার করে অমৃতসর চুক্তির মাধ্যমে ডোগরা রাজবংশ স্থাপন করেছিল রাজা গুলাব সিং। এই রাজবংশের চতুর্থ রাজা হলেন হরি সিং, যিনি ব্রিটিশের থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় জম্মু-কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট - ১৯৪৭' পাশ করার মাধ্যমে ভারত মহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুইদেশে বিভক্ত করে ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করে। সেই সময় সংযুক্ত ভারতে ৫৬২টি করদ রাজ্য (princely state) ছিল, যার একটি হলো জম্মু-কাশ্মীর। ১২ মে ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন যে স্মারকলিপি প্রকাশ করে তাতে এই সমস্ত করদ রাজ্যগুলোর অবস্থা (status) কী দাঁড়াবে তা বলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্তানুযায়ী এই সব করদ রাজারা কোন একটি দেশের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারেন অথবা স্বাধীন থাকতে পারেন।

তবে কোন দেশের সাথে সংযুক্ত হতে চাইলে সেই ভূখণ্ড সেই দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ, কোন করদ রাজ্যের ভূখণ্ড কোন দেশের হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ছিল সেই করদ রাজ্যের রাজাদের।

ভারত পাকিস্তান ভাগ হওয়ার মুহূর্তে শেখ আবদুল্লাহ ছিলেন জেলে বন্দী। তিনি সেপ্টেম্বরে ছাড়া পান। জেল থেকে বাইরে বের হয়ে তিনি এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, 'যদি জম্মু-কাশ্মীরের বসবাসকারী ৪০ লাখ অধিবাসীকে উপেক্ষা করে রাজা পাকিস্তান হোক অথবা ভারত, কারো সাথে যুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করে, তাহলে আমি বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরব এবং লড়াইকে আহ্বান করব।' স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে গান্ধীজীও কাশ্মীরে গিয়ে বলেন–'... কাশ্মীরিদের ইচ্ছাই ঠিক করবে কাশ্মীরের ভাগ্য।'

রাজা হরি সিং কোন এক দেশের সাথে যুক্ত হবেন, নাকি স্বাধীন থাকবেন সেই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। এই সময় তিনি বলেছিলেন 'আমার রাজ্য দুইদেশের সাথে সংলগ্ন অঞ্চল। দুই দেশের সাথেই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংশ্লিষ্টতা আছে। আমার রাজ্যের সাথে সোভিয়েত ও চিনের সীমান্ত রয়েছে। ... আমার রাজ্যের অধিবাসীদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত ভালো হবে–কোন একটি দেশের (dominion) সাথে যুক্ত হওয়া, নাকি উভয়দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখে স্বাধীন থাকা–তা নিয়ে ভাবনার জন্য আমি সময় নিতে চাই।' এই রকম পরিস্থিতিতেই ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের উপাজাতি একটা অংশ কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনীও এই আক্রমণে শামিল হয়। এমতাবস্থায় রাজা হরি সিং ভারতের সাহায্য চায়। হরি সিং ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করলেই একমাত্র সৈন্য পাঠাতে সম্মত হয় ভারত এবং অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে হরি সিং-এর স্বাক্ষরিত দলিলে মাউন্টব্যাটন (তখন ভারতের গভর্নর) স্বাক্ষর করলে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়। মহারাজা দলিলে স্বাক্ষর করলেও তা ছিল শর্ত-সাপেক্ষ, বলা হয়েছিল যে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে কাশ্মীরের স্বাধীনতা থাকবে এবং জম্মু-কাশ্মীর কনস্টিটিউশন অ্যাক্ট–১৯৩৯ অনুযায়ী রাজ্য পরিচালিত হবে। দ্বিতীয়ত, ২৭ অক্টোবর ১৯৪৭ সালেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও জানানো হয় যে বিশেষ পরিস্থিতিতে কাশ্মীর রাজ্যের ভারতভুক্তি স্বীকার করে নিলেও 'Government' s wish that as soon as law and order have been restored in Kashmir and her soil cleared of the invader, the question of the state's accession should be settled by a reference to the people.' [সরকারের ইচ্ছা যে, যখনই কাশ্মীরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ও কাশ্মীরের মাটি দখলদার মুক্ত হয়, তখন এর সংযুক্তির প্রশ্নটি জনগণের মতামতের ভিত্তিতে ঠিক করা হবে।] (লর্ড মাউন্টব্যাটনের চিঠি মহারাজা হরি সিং-কে) অর্থাৎ এই ভারতভুক্তি কখনোই চূড়ান্ত নয় এবং ভারতের সমস্ত নেতারাই বহুবার বলেছেন যে কাশ্মীরের দুঃসময়ে সাহায্য করে তার বিনিময়ে কাশ্মীরের অধিবাসীদের মতের বিরুদ্ধে রাজ্যটিকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। যেমন, ২৫ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারবার্তায় নেহেরু বলেছিলেন 'আমি এইটি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে কাশ্মীরকে বিপদের সময় প্রয়োজনীয় সাহায্য করা কখনোই ভারতভুক্তির বিষয়ে প্রভাবিত করার পরিকল্পনা নয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যা আমরা ইতিপূর্বে বহুবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি তা হলো যে কোন বিতর্কিত অঞ্চল বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের ইচ্ছার দ্বারাই নির্ধারিত হবে এবং আমরা সেই মতকেই মেনে চলি।' ২ নভেম্বর এক বেতার বক্তৃতাতে নেহেরু সেই জনগণের ইচ্ছার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, 'It was in accordance with this policy that we added a proviso to the Instrument of Accession of Kashmir'। [এই নীতিমালা অনুসরণ করেই কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আমরা এই শর্তটি যুক্ত করি।]

১৯৪৭ সালের ১১ ডিসেম্বর জয়েন্ট ডিফেন্স কাউন্সিলের একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে ইউনাইটেড নেশনের তত্ত্বাবধানে গণভোটের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, উপজাতিদের কাশ্মীর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজা হরি সিং ইনস্ট্রুমেন্ট অব এক্সেশনে স্বাক্ষর করলেও তা কখনোই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়নি এবং সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, অবস্থা স্বাভাবিক হলেই কাশ্মীরের জনগণই ঠিক করবে তাদের অবস্থান। সেই হিসাবে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে জাতিসংঘে বিরোধ মীমাংসার জন্য আবেদন করে ভারত। সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভারতের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শেতলাবাদ পরিস্কার করে বলেন : 'যদিও মহারাজা এবং শেখ আবদুল্লাহর তরফ থেকেই অনুরোধ এসেছিল, তথাপি ভারত সরকার এই বিষয়ে সজাগ যে অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করা হয়েছিল শুধুমাত্র এই শর্তে যে, শান্তি ফিরে এলেই জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা উপযুক্তভাবে নির্ধারিত করা হবে। এই শর্তে এবং একমাত্র এই শর্তেই ভারত সরকার অন্তর্ভুক্তিকে স্বীকার করেছে'।

১৯৪৮ সালের ১৩ আগস্ট উভয়পক্ষের সম্মতিতে ইউ-এন সিকিউরিটি কাউন্সিলে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে তিনটে ভাগ ছিল। প্রথম ভাগে (part-I) বলা হয়েছিল উভয়পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ করবে এবং কমিশন একজন সামরিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবেন যিনি যুদ্ধবিরতি তত্ত্বাবধান করবেন। দ্বিতীয় ভাগে (part-II) ছিল দুইটি অংশ - অ এবং ই। অ-অংশে বলা হয়েছিল পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীর থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নেবে এবং এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তান থেকে জম্মু-কাশ্মীরে যাঁরা অনুপ্রবেশ করেছে তাদের সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। পাকিস্তানের সৈন্যদের ছেড়ে যাওয়া অঞ্চলের প্রশাসনের কাজ করবে কমিশনের তত্ত্বাবধানে আঞ্চলিক শাসন সংস্থা। ই-অংশে বলা হয়েছিল যে পাকিস্তান সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গেলে ভারত যুদ্ধবিরতি লাইন বরাবর কমিশনের নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ সৈন্য রাখতে পারবে এবং কমিশন যেখানেই প্রয়োজন মনে করবে সেখানেই তার পর্যবেক্ষক রাখতে পারবে। তার

সাথে বলা হয়েছিল–'The Government of India will undertake to ensure that the government of the State of Jammu and Kashmir will take all measures within its power to make it publicly known that peace, law and order will be safeguarded and that all human and political rights will be guaranted' অর্থাৎ ভারত সরকার এটা নিশ্চিত করবে যে, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সরকার তার ক্ষমতাবলে জনগণের শান্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে, যাতে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত হয়। তৃতীয় ভাগে (part-III) বলা হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছার দ্বারাই নির্ধারিত হবে জম্মু-কাশ্মীরের অবস্থান এবং সেই সুস্থ্য গণভোট আয়োজনের জন্য ভারত ও পাকিস্তান ইউ-এন কমিশনের সাথে আলোচনা শুরু করবে।

সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই গণভোট তো হয়নি বটে, সেই নিয়ে দুইপক্ষের কমিশনের সাথে যে আলোচনার কথা ছিল তাও কোনদিন হয়নি। কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকার ইচ্ছার কারণেই এই গণভোট নিয়ে কোন পক্ষই–না ভারত, না পাকিস্তান–কোন আগ্রহ দেখায়নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ইউ-এন রেজেলুশন যেখানে কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানকে সমস্ত সৈন্য এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অধিবাসীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার শর্ত দিয়েছিল, তাহলে ভারত সেই নিয়ে কোন দাবি তোলে না কেন। ভারত দাবি তুলত, যদি বুঝতে পারত যে গণভোট হলে সবাই ভারতের পক্ষে রায় দেবে। কিন্তু নেহেরু এবং তাঁর সভাসদরা সকলেই জানত যে ভোট হলে কাশ্মীর শেখ আবদুল্লাহর পক্ষে অর্থাৎ স্বাধীন কাশ্মীরের পক্ষে ভোট দেবে। এই কথার প্রমাণও মিলবে ইন্দিরা গান্ধীর তাঁর বাবাকে লেখা একটি চিঠি থেকে। এই সময়ে ইন্দিরা গান্ধী গিয়েছিলেন কাশ্মীর পর্যবেক্ষণে এবং বাবাকে চিঠিতে জানাচ্ছেন যে 'এখানে তো গণভোটে সবাই শেখ সাহেবের পক্ষেই কথা বলছে।' পাকিস্তান কোনদিন ইউ-এন রেজেলুশন মেনে তার সৈন্য ও লোকজন কাশ্মীর অঞ্চল থেকে সরায়নি, ভারতও সেই দাবি কোনদিন তোলেনি (সরিয়ে নিলেই গণভোট করতে হয়), গণভোটও কোনদিন হয়নি আর জম্মু-কাশ্মীরের অধিবাসীদের শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

অন্য সমস্ত রাজ্য ভারত বা পাকিস্তানে সহজেই অন্তর্ভুক্ত হলেও জম্মু-কাশ্মীরের রাজা হরি সিং শর্তসাপেক্ষে 'instrument of accession' দলিলে ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর স্বাক্ষর করে ভারতের সাথে যুক্ত হয়। এই সমস্ত শর্ত ছিল কাশ্মীরের স্বাধিকার রক্ষা সম্পর্কিত। (হায়দারাবাদ ও জুনাগড়ের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেছিল, তবে বর্তমান আলোচনার সাথে সেই ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই বলে সেই আলোচনার প্রয়োজন নেই।)

৩৭০ ধারা কী এবং কীভাবে এলো

কেন ৩৭০ ধারা এবং তার গুরুত্বই বা কি, সে কথা বোঝার জন্য জম্মু-কাশ্মীরের ১৯৪৭-পূর্ব ইতিহাসের সামান্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্রিটিশের অধীনে যতগুলো করদ রাজ্য ছিল, সেই সমস্ত রাজ্যের কোনখানে রাজার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। একমাত্র কাশ্মীর, যেখানকার অধিবাসীরা তাদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। ১৯৩০ সালে ন্যাশনাল মুসলিম কনফারেন্স নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলের নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণ-আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। তাঁরা রাজার হাত থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য 'কাশ্মীর ছাড়ো' (Quit Kashmir movement) আন্দোলন সূচনা করে। দল প্রতিষ্ঠার কয়েকবছর বাদে এক সম্মেলনে শেখ আবদুল্লাহ দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটিকে বাদ দিয়ে দেন। কাশ্মীরের এই আন্দোলন ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের যে ধারা তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধারা। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কাশ্মীরের নিজস্ব জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠতে থাকে–তাঁরা রাজতন্ত্রের অবসান দাবি করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করে। দলের উদ্দেশ্য হিসাবে ঠিক হয় জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংবিধানসম্মত রাজনৈতিক শাসন। কাশ্মীরিদের নিজস্ব আত্মপরিচয় তাই ভারত মহাদেশের অন্যান্য রাজ্যের আত্মপরিচয় থেকে স্বতন্ত্রভাবেই গড়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন কাশ্মীরের আন্দোলন এতটাই প্রবল ছিল যে, সেখানকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনায় না নেওয়া সম্ভব ছিল না। শেখ আবদুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় জাতিয়তাবাদী নেতা। কাশ্মীরের জনগণের স্বাধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি নেতৃত্বে উঠে এসেছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করলেও সংবিধানে ৩৭০ ধারা অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে। এখন যাঁরা ৩৭০ ধারা বাতিল করার কথা বলছে, তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আর একটি মিথ্যা কথা বলছে। তাঁরা বলছে যে 'instrument of accession'-এ তো ৩৭০ ধারার উল্লেখ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ সালে যখন ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়, তখনও ভারতের কোন সংবিধান রচিত হয়নি। সেই কারণে, 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট–১৯৪৭'-এ বলা হয়েছিল যে, যতদিন না 'কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি' গঠিত হয়ে সংবিধান চূড়ান্ত করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশের 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫' দ্বারা ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করা হবে। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি-তে সংবিধান চূড়ান্ত করা হয় ১৯৪৯ সালে এবং তা ভারতে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। এই কারণে, ভারতের যখন সংবিধানই তৈরি হয়নি, সেই সংবিধানের ৩৭০ ধারা 'instrument of accession'-এ স্বাক্ষরের সময়ে থাকবে কীভাবে?

ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষরের পর ১৯৪৮ সালে শেখ আবদুল্লাহকে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়। শেখ আবদুল্লাহ, মির্জা আফজল বেগ, মাওলানা সাঈদ মাসুদি এবং মোতি রাম সংবিধান রচনার বিতর্কে অংশ নিতে ভারতের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি-তে যোগদান করেন। কাশ্মীরি জনগণের বিশেষ অধিকার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলের সাথে শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিনিধিদের পাঁচমাসব্যাপী মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আলোচনা হয়। শেখ আবদুল্লাহর সাথে সর্দার প্যাটেলের মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং গোপালস্বামী আয়েঙ্গার মতপার্থক্য দূর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। উভয়পক্ষের সম্মতিতে একটি খসড়া প্রস্তুত হয় ১৬ অক্টোবর এবং ১৭ অক্টোবর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি-তে পেশ করা হয় এবং গৃহীত হয়।

এইখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করলে বোঝা সম্ভব হবে যে শেখ আবদুল্লাহ কেন প্রথম থেকেই ভারতীয় নেতাদের সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঘটনাটি হলো উভয়পক্ষের সম্মতিতে যে খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছিল, এসেমব্লিতে পেশ করার সময় শেখ আবদুল্লাহর অজান্তেই সেখানে কিছু সংশোধন করা হয় এবং সেইভাবেই গৃহীত হয়। শেখ আবদুল্লাহ ও মির্জা বেগ তখন বাইরে লবিতে গিয়েছিলেন, এই সময় তিনি সংশোধনের কথা শুনে দৌড়ে ভেতরে যান এবং জানতে পারেন। ১৮ অক্টোবর শেখ আবদুল্লাহকে চিঠিতে আয়েঙ্গার জানান যে 'trivial change' করা হয়েছে, অর্থাৎ গুরুত্বপুর্ণ কিছু নয়। শেখ আবদুল্লাহ নেহেরুর কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেন এবং নেহেরুর কাছে নভেম্বর মাসে চিঠিতে প্যাটেল ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এই পরিবর্তনকে 'trivial change' বললেও, আইন বিশারদ নুরানির অভিমত হলো যে, যদি সেই সংশোধন করা না হতো তবে ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করা যেত না। যাই হোক, এতসব কাণ্ডের পরও এই ৩৭০ ধারা কাশ্মীরকে যে সব স্বাধীন ও অন্য রাজ্যের সাপেক্ষে স্বতন্ত্র অধিকার দিয়ে গৃহীত হইয়েছিল, তা উল্লেখযোগ্য অবশ্যই। এই ধারা অনুযায়ী কোন পক্ষের দ্বারাই এই সব অধিকার খর্ব করা অথবা তার কোন অংশ সংশোধন, সংযোজন বা বাতিল করার অধিকার নেই। (Article 370 records a solemn compact. Neither side can amend or abrogate it unilateraly, except in accordance with the terms of that provision)।

কাশ্মীর ছাড়া আর কোন করদ রাজ্যই এই ধরণের বিশেষ সুবিধা ভারতের সংবিধানে প্রাপ্ত হয়নি। কেন? প্রথম কারণ, কাশ্মীরের জনগণ ভারত স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই নিজেদের স্বাধীন ও ধর্ম-নিরপেক্ষ একটি রাজ্য গড়ে তোলার আন্দোলনে যুক্ত ছিল, যে ইতিহাস অন্যান্য করদ রাজ্যের অধিবাসীদের ছিল না। অর্থাৎ, কাশ্মীরিদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়ার পূর্বের ইতিহাস। দ্বিতীয়ত, এই কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে শেখ আবদুল্লাহর মতামতের কারণেই রাজা হরি সিং একমাত্র দেশিয় রাজা হিসাবে ভারতভুক্তির দলিলে উল্লেখ করেছিলেন যে 'এই দলিলে যাই থাক ভবিষ্যতে ভারতের যে সংবিধান রচিত হবে তাকে যে কোনভাবে মেনে নেওয়ার সম্মতি এটা নয় এবং ভবিষ্যতের ভারতবর্ষের সংবিধানের অধীন ভারত সরকারের সঙ্গে কোন সমঝোতায় আমার স্বাধীন ইচ্ছার পায়ে বেড়ি হিসাবে কাজ করবে না।'(Nothing in this instrument shall be deemed to commit me in anyway to acceptance of any future Constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangements with the Government of India under any such future Constitution)। এই কারণে, কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে শেখ আবদুল্লাহর সম্মতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণ অন্তর্ভুক্তির দলিলে রাজা স্বাক্ষর করেছেন বলেই ভারতীয় সংবিধানে কোন ধারা গৃহীত হলেই কাশ্মীরকে তা মানতে হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।

৩৭০ ধারা অনুযায়ী কাশ্মীরকে নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। তার কারণ হলো যে, ভারতের সংবিধান রচনা ও গৃহীত হওয়ার অনেক আগেই, ১৯৪৮ সালের ৫ মার্চ কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান রচনার কথা মহারাজের অধ্যাদেশের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। ভারতের সংবিধান রচিত হওয়ার আগেই রাজার দেওয়া এই অধ্যাদেশ কাশ্মীরিদের যে অধিকার দিয়েছিল তা সংরক্ষিত রাখতেই ৩৭০ ধারায় এই নিজস্ব সংবিধানের দাবিকে মেনে নিতে হয়। ভারতভুক্তির দলিলে বলা হয়েছিল পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, অর্থ ও সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কাশ্মীরের স্বাধিকার থাকবে। ভারতভুক্তির ব্যাপারে ইনস্ট্রুমেন্ট অব এক্সেসন অন্যান্য করদরাজ্যের তুলনায় কাশ্মীরের ক্ষেত্রে কেন স্বতন্ত্র তা ব্যাখ্যা করেছেন আইন বিশেষজ্ঞ এ জি নুরানি। তা হলো একমাত্র কাশ্মীরের ক্ষেত্রেই মহারাজার চিঠি এবং তার উত্তরে লর্ড মাউন্টব্যাটনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ইনস্ট্রুমেন্ট অব এক্সেশনের অংশ। 'In the case of Kashmir, the letters exchanged between the Maharja and the Viceroy, itself a unique instance of the instrument of accession being accompanied by collateral documents, and the pronouncements made then would suggest that the accession was provisional and conditional'। এই শর্তের কারণেই ৩৭০ ধারা এসেছিল এবং ৩৭০ ধারাকে বাতিল করলে ভারতভুক্তির যৌক্তিকতার বিনাশ ঘটে। এই ধারা কাশ্মীরকে এই অধিকার দিয়েছিল যে ভারত সরকারের লোকসভায় গৃহীত যে কোন আইন কেবলমাত্র তখনই কাশ্মীরে কার্যকর হতে পারে যখন তা কাশ্মীরের বিধানসভা অনুমোদন করবে।

আজকে ভারতের বিজেপি সরকারের এই ধারা কাশ্মীরের নির্বাচিত প্রতিনিধি সভার সম্মতি ব্যতিরেকে বাতিল করার কোন সাংবাধানিক ক্ষমতা নেই। কারণ, এই মুহূর্তে কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে এবং নির্বাচিত বিধানসভা সেখানে নেই। তাদের অনুমোদন ছাড়া লোকসভায় এই বিল গৃহীত হলেও যদি রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর করে আইনে রূপ দিতে চান, তবে তা হবে চূড়ান্ত অসাংবিধানিক, কাশ্মীরের জনগণকে ভারতভুক্তির সময় তাদের স্বাধীকারের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা।

৩৭০ ধারাকে অবজ্ঞা কি শুধু বিজেপির কাজ?

একটা প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কাশ্মীরের জনগণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরাই আজকে কেন এত ভয়ঙ্কর ভারতবিরোধী হয়ে উঠলেন। চরম সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি তো মাত্র ৬ বছর ক্ষমতায় আছে। কিন্তু তার আগে? কেউ যদি মনে করে বিজেপি'র মতো সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে বলেই ৩৭০ ধারা বাতিলের মতো ঘটনা ঘটতে পারলো, তবে কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণে ভুল হবে। শুরু থেকেই এক পক্ষ উদারপন্থী জাতিয়তাবাদী কূট কৌশলে, অন্যপক্ষ হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে কাশ্মীরকে গিলতে চেয়েছে। সেজন্য বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল অনেক আগে এবং সেটা উদারনৈতিক আদর্শবাদ বলে পরিচিত নেহেরুর সময়েই। ৩৭০ ধারায় উল্লেখ থাকা বিভিন্ন অধিকারকে একটির পর একটি ভঙ্গ করে, কখনো রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে কেড়ে নিয়ে কার্যত বর্তমানে ৩৭০ ধারাকে সারবত্তাহীন বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কথা বিরোধীদের কথা নয়, এই কথা বলেছিলেন ১৯৬৪ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা এবং তাও লোকসভায় দাঁড়িয়ে। তিনি বলেছিলেন 'যা হয়েছে তা হলো এখন শুধুমাত্র একটা খোল পড়ে আছে। ধারা ৩৭০ আপনারা রাখুন আর না রাখুন সারবস্তুর দিক থেকে একে সম্পূর্ণ ফাকা করে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ' (What happens is that only the shell is there. Article 370, whether you keep it or not, has been completely emptied of its contents. Nothing has been left in it)। গুলজারিলাল নন্দার সেইদিনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, "'যখন সাধারণভাবে সংবিধান সংশোধন করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কঠোর (stringent) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তখন ৩৭০ ধারায় যে প্রক্রিয়ার কথা বলা আছে তা খুব সহজ'–রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ। পক্ষান্তরে, অবশিষ্ট ভারতের ক্ষেত্রে যদি রাজ্যের কোন অধিকার হ্রাস করতে হয় এবং তদানুসারে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হয়–তবে ৩৬৮ ধারায় যে বিস্তৃত বিধান আছে তাকে অনুসরণ করতে হয়। জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ৩৭০ ধারা অনুযায়ী একটি রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশই (executive order) যথেষ্ট।" (A. G. Noorani) এই প্রক্রিয়া যে আইনসিদ্ধ নয়, সর্বৈব বে-আইনি কাজ তা অনেক আইন বিশেষজ্ঞই বলেছেন, কারণ ৩৭০ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কোন অধ্যাদেশই কার্যকরী হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা অনুমোদন না করে। আশ্চর্যের কিছু নেই যে নেহেরু-নন্দা পরবর্তী সময়েও সমস্ত নেতারা ৩৭০ ধারার এই ব্যাখ্যা মেনে এসেছেন, বিজেপিও তাকেই হাতিয়ার করেছে।

১৯৪৭ পরবর্তী কাশ্মীরের ইতিহাস বলছে যে স্বাধীনতার অল্প কিছুদিন পর থেকেই ভারত সরকার ৩৭০ ধারা মেনে কাশ্মীরের স্বাধীকারকে অস্বীকার করার নানা রকম প্রচেষ্টা শুরু করে এবং তা নেহেরুর সময় থেকেই। ৩৭০ ধারায় যদিও বলা হয়েছিল যে এই ধারার কোন পরিবর্তন বা সংশোধন উভয়পক্ষের সম্মতি ছাড়া করা যাবে না, তবু নানাভাবে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে কাশ্মীরের বিভিন্ন ক্ষমতাকে একে একে কেড়ে নেওয়া হতে থাকে। শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে নেহেরুর বিরোধও এই নিয়ে তখনই শুরু হয়।

জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধান রচনার জন্য 'কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি' গঠিত হয় ১৯৫১ সালে এবং ভারতের সাথে সম্পর্কের রূপরেখা নির্দিষ্ট করার জন্য শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নেহেরুর সাথে আলোচনা শুরু হয়। ১৯৫২ সালে এই সম্পর্কিত দিল্লি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই কাশ্মীরিদের স্বাধীনতার প্রশ্নে শেখ আবদুল্লাহর অনমনীয় মনোভাবের কারণে নেহেরুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫৩ সালে অসাংবিধানিকভাবেই শেখ আবদুল্লাহকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত করে দেওয়া হয়। এর পরেই রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে ভারতীয় সংবিধানের অনেক অনুচ্ছেদ (provisions) কাশ্মীরের সংবিধানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে যখন ১৯৫৭ সালে কাশ্মীরের সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়, তখন সেখানে কাশ্মীরকে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়। আজকে বিজেপি ৩৭০ ধারা বাতিল করতে গিয়ে একেই অন্যতম হাতিয়ার করে বলছে 'কাশ্মীরের সংবিধানেই তো তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছে যে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'।

আর একটি বিষয়েও গায়ের জোরে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে এবং আজকে ৩৭০ ধারা বাতিলের পক্ষে যুক্তি হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারতের সংবিধানে ৩৭০ ধারা শুরু হয়েছে এই কথা দিয়ে 'Temporary provisions with respect to the state of Jammu and Kashmir.' [জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্যের জন্য নির্ধারিত সাময়িক বিধানসমূহ] এই কথা উল্লেখ করে ভারতীয় শাসকদের যুক্তি হলো যে ধারা সাময়িক ব্যাবস্থা বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা আর কতদিন সংবিধানে থাকবে? যদিও ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায় আছে যে ৩৭০ ধারা আর সাময়িক নয়, এটা 'পার্মানেন্ট' বলে বিবেচিত হবে তবুও এর গুরুত্ব ততটুকু যতটুকু আইনি ব্যবস্থার মধ্যে আশা করা যায়। কিন্তু সমাজ-ইতিহাসের যুক্তি তার থেকেও অনেক বড়। মনে রাখতে হবে যে নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাশ্মীরের ভারতভুক্তির যে যে শর্তে সমঝোতা হয়েছিল তাতে অন্যান্য অধিকারের সাথে ছিল ক. কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান থাকবে; খ. কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান নির্বাচিত পদাধিকারী বিবেচিত হবেন 'প্রধানমন্ত্রী' বলে, অন্য প্রাদেশিক রাজ্যের মতো 'মুখ্যমন্ত্রী' নয়; গ. কাশ্মীরের নিজস্ব পতাকা থাকবে যা সরকারিভাবে ব্যবহৃত হবে সর্বত্র। এর সব কয়টি অন্যান্য প্রাদেশিক রাজ্যের তুলনায় মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র।

কিন্তু যখন ভারতের সংবিধান রচিত হচ্ছে তখন পর্যন্ত কাশ্মীরের 'কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি' গঠিত হয়নি এবং সংবিধানও রচিত হয়নি। সেই কারণে ভাবনাটা ছিল এই যে যেহেতু কাশ্মীরের স্বতন্ত্র সংবিধান থাকবে, সেইখানেই কাশ্মীর ঘোষণা করবে ভারতের সাথে তাদের সম্পর্কের রূপরেখা–সেইহেতু ততদিন পর্যন্ত ৩৭০ ধারা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে থাকবে। যদি কাশ্মীরের 'কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি' এই ধারা বাতিলে রাষ্ট্রপতির অধিকারে সম্মত না হয়, তাহলে এই ধারা হবে স্থায়ী। এই কথা খুব স্পষ্টভাবে ৩৭০ ধারার উপধারা-৩ এ বলা আছে। (provided that the recommendation of the Constituent assembly of the state referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification) আমরা দেখতে পাই যে এর পরবর্তী সময়েই কাশ্মীরের সংবিধানে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কোন কোন বিষয় থাকবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। নেহেরুর অভীষ্ট ছিল কত তাড়াতাড়ি কাশ্মীরকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের অঙ্গীভূত করা যায়, পক্ষান্তরে শেখ আবদুল্লাহ চাইছিলেন কীভাবে কাশ্মীরের স্বাতন্ত্রকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া যায়। দুইজনের দুই বিপরীত উদ্দেশ্যের কারণ হলো নেহেরু ভারতের নব-উত্থিত বুর্জোয়াশ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে সেই শ্রেণির সম্প্রসারণবাদী স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছিলেন, অন্যদিকে শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরের জাতিগোষ্ঠীগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষা করতে চাইছিলেন।

এই কারণে সেইদিন, শুধু বিজেপি নয়, উদারনৈতিক নেতা বলে সারা বিশ্বে পরিচিত নেহেরু এবং তাঁর সভাসদদের মনোবাঞ্ছাও ভিন্ন কিছু ছিল না যদিও আধিপত্য বিস্তারের পন্থা অবলম্বনে সামান্য ভিন্ন চিন্তা ছিল। এই কথা বোঝা যাবে যদি আমরা দেখি ১৯৬৩ পরবর্তী সময় থেকেই কংগ্রেসের নেতাদের বক্তব্য। যখন তার আগেই শেখ আবদুল্লাহকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করে, বছরের পর বছর জেলে বন্দি রেখে, কাশ্মীরের সংবিধানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ–তখন তাদের আসল রূপ বেরিয়ে আসতে বেশি সময় নেয়নি। ১৯৬৩ সালের ২৭ নভেম্বরে লোকসভায় দাঁড়িয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু কী বলেছিলেন? তিনি বলেন যে '৩৭০ ধারা তো ক্ষয়ে গেছে। গত কয়েক বছরে এমন অনেক কিছু করা হয়েছে যার কারণে কাশ্মীর এখন ভারতের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ। কোন সন্দেহ নেই যে কাশ্মীর পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। .... আমারা বুঝতে পারছি এইভাবে ক্রমাগত ৩৭০ ধারা ক্ষয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আগামী দুই-এক মাসের মধ্যে এইগুলো সম্পূর্ণ হবে। আমাদের উচিত এইরকম প্রয়াস অব্যাহত রাখা।' (That Article 370 has been eroded, if I may use the word, and many things have been done in the last few years which have made the relationship of Kashmir with the Union of India very close. There is no doubt that Kashmir is fully integrated… We feel that this process of gradual erosion of Article 370 is going on. Some fresh steps are being taken and in the next month or two they will be completed. We should allow it to go.)

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা ১৯৬৪ সালের ৪ ডিসেম্বরে লোকসভায় বলেন, 'জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের সংবিধানকে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় হলো ৩৭০ ধারা। ... এটা এমন একটা 'টানেল' যার ভেতর দিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক বাহনই ঢুকে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরো যাবে।' (the only way of taking the Constitution (of India) into J&K is through the application of Article 370… It is a tunnel. It is through this tunnel that a good deal of traffic has already passed and more will.)। আশ্চর্য নয় যে, বিজেপি কংগ্রেসের দেখানো এই পথ দিয়েই গোটা ৩৭০ ধারাকেই বাতিল করে দিয়েছে বে-আইনিভাবে। বিজেপিও ৩৭০ ধারার ৩ নম্বর উপধারাকে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করেছে। যে কাজ কংগ্রেস করেছিল পঞ্চাশের দশক থেকেই সংবিধানের অঙ্গীকারকে অগ্রাহ্য করে এবং বে-আইনিভাবে।

৩৭০ ধারা কি কাশ্মীরের উন্নয়নের পথে বাঁধা?

অমিত শা ৩৭০ ধারা বাতিলের পক্ষে যুক্তি করতে গিয়ে বলেছেন যে জম্মু-কাশ্মীরে এই ধারা থাকার জন্যই নাকি কোন অর্থনৈতিক বিকাশ নেই। কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি, পর্যটন শিল্পেরও প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিকাশের সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু, সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে যে অমিত শা-র এই কথার কোন সারবত্তা নেই। যেমন, সারা ভারতে দারিদ্র সীমার নিচে থাকা জনসংখ্যার শতকরা হার যেখানে ২১.৯২, জম্মু-কাশ্মীরে শতকরা হার ১০.৩৫ শতাংশ। সারা ভারতে গড় শিশু মৃত্যুর হার যেখানে প্রতি হাজারে ৩৪, জম্মু-কাশ্মীরে সেই হার ২৪, এমন কি উন্নয়নের ঢাক পেটানো মোদির রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার বেশি–প্রতি হাজারে ৩০।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজতন্ত্র বিদায়ের পর জম্মু-কাশ্মীরের ভূমি-সংস্কারে সবচেয়ে সফল রাজ্য হলো জম্মু-কাশ্মীর। যে কারণে জম্মু-কাশ্মীরে ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম। জম্মু-কাশ্মীরের অনগ্রসরতার চিত্র অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় খারাপ তো নয়ই, অনেকক্ষেত্রে বরং ভালো।

ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী শ্রেণিস্বার্থের কারণেই যে ৩৭০ ধারা বাতিল করেছে তাকে আড়াল করার জন্য এই সব ভ্রান্ত তথ্য দেওয়া হচ্ছে।

কাশ্মীরের আন্দোলন কি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন?

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পূর্ব এবং পরবর্তী ইতিহাস থেকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে কাশ্মীর রাজ্যের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি অন্যান্য প্রাদেশিক রাজ্যের মতো ছিল না। নিজস্ব সংবিধান, প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং নিজস্ব পতাকার দাবি মেনে নেওয়া হয়েছিল কাশ্মীরের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার কারণেই। কাশ্মীরের জনগণ যদি কালক্রমে স্বেচ্ছায় ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতে স্বীকার করত তাহলে কারোর কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রম এবং ক্রমাগত বিশ্বাসভঙ্গতার কারণে কাশ্মীরি জনগণের আত্মমর্যাদা এমনভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে যে গত শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশক থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি দানা বাঁধতে থাকে। কাশ্মীরের জনগণের এই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নেতৃত্ব দিতে উপত্যকার সমস্ত রাজনৈতিক দল ব্যর্থ না হলে এই আন্দোলন এতদিনে হয়ত চূড়ান্তরূপ ধারণ করতে পারত এবং কাশ্মীরের জনগণের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। এর পরিবর্তে এই সমস্ত দলগুলো কাশ্মীরের জনগণের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে টিকে থাকতেই বেশি আগ্রহী ছিল। এর অন্যতম প্রমাণ হলো গত নির্বাচনের পর বিজেপির মতো নিকৃষ্ট সাম্প্রদায়িক ও মুসলিমবিরোধী দল বিজেপির সাথে জোট গঠন করে মেহবুবা মুফতির মুখ্যমন্ত্রী হতে অসুবিধা হয়নি।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আলোচনা করতে গিয়ে রোজা লুক্সেমবার্গের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লেনিন খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, যদি আমরা কোন জাতির 'আত্মনিয়ন্ত্রণ'–এর অর্থ বুঝতে চাই তবে আইনি সংজ্ঞার মধ্যে খুঁজলে হবে না। আমাদের খুব ভালো ভাবে জাতায়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক (historico-economic) প্রেক্ষাপট বিচার করতে হবে। যদি আমরা তা করি তাহলে দেখব যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো বিজাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে (alien national bodies) রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলা। আমাদেরও কাশ্মীরের আন্দোলনের চরিত্র বোঝার জন্য ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিচার করতে হবে, যেখান থেকে বোঝা যাবে যে কাশ্মীরের ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজের প্রাচীন ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তাদের স্বাধীন আত্ম-পরিচয়ের ইতিহাস ভারতের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক সময়ে তাদের জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করেছিলেন বৃহত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যেই তাদের স্বতন্ত্র আত্ম-পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন। বুর্জোয়া আগ্রাসন যে ততটা উদার নয়, সে কথা সেদিন তাঁরা বুঝতে পারেননি।

ভারতীয় বুর্জোয়া নেতারা সর্বদা বলে আসছেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য (inalienable) অঙ্গ। (দুঃখজনক হলেও সত্যি যে তার সাথে গলা মিলিয়ে এক শ্রেণির ভারতীয় বামপন্থী দলও কোন রকম ব্যাখ্যা ছাড়াই এই অবিচ্ছেদ্যতার তত্ত্ব বিলি করেন)। কেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ? একথা ঠিক, কাশ্মীর হয়ত কালক্রমে একদিন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতে পারত, যদি ভারতীয় বুর্জোয়া দলগুলো কাশ্মীরের স্বাতন্ত্রকে স্বীকার করে ৩৭০ ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতেন। কিন্তু যখন ৩৭০ ধারাকে বাতিলই করে দেওয়া হয়, তখন প্রমাণ হয় যে ৩৭০ ধারাকে বজায় রাখার দ্বারা স্বাতন্ত্রের যেটুকু প্রতীকী মর্যাদা ছিল তাও সাম্রাজ্যবাদী ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি মেনে নিতে পারে না। সংযোগের যে সূত্র ইতিহাসের দাবি মেনে গড়ে উঠেছিল, তাকে যদি গায়ের জোরেই কেউ অস্বীকার করতে চায় এবং ধ্বংস করে ফেলে তবে বিচ্ছেদ তো অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সংকটের যুগে, বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে আর উদারনৈতিক আচরণ আশা করা যায় না, বরং তাঁরা আগ্রহী এমন একটি বন্ধনের মধ্যে কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গীভূত করতে (অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার করাতে) যা হয়ত, লেনিনের ভাষায়, 'Asiatically despotic ties'।

দীর্ঘদিন ধরে যে অশান্ত কাশ্মীরের কথা আমরা শুনি তা হলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর। প্রায়শই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল কার্যত অচল হয়ে থাকে। মানুষের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হয় সামরিক জিপের আনাগোনা আর ভারী বুটের আওয়াজে। 'আর্ম ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' (আফসা) চালু রেখে কাশ্মীরে সামরিক বাহিনীর যে কোন কাজকে বিচারের বাইরে রাখা হয়েছে, আর সেই আইনের রক্ষাকবচকে ঢাল করে সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের কোন সীমা নেই। তার সাথে বর্তমানে ৩৭০ ধারা বাতিলের পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরও জটিল এবং উত্তপ্ত করে তুলবে সেই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। সামরিক বাহিনীকে নিয়োগ করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশ কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, এমন কি ভারতের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বলশালী আমেরিকার পক্ষেও নিজেদের স্বার্থে কোন সমাধান অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারেনি। নিরস্ত্র মানুষই না খেয়ে থেকেও সেইসব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে। ভিয়েতনাম যেমন উদাহরণ, তেমনি আমাদের বাংলাদেশও এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কোন বিশেষ ভূখণ্ডের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সামরিক বাহিনী দিয়ে দীর্ঘদিন দাবিয়ে রাখা যায়নি। আমরা নিশ্চিত, ভারতের এই পদক্ষেপ কাশ্মীরি জনগণের মধ্যে আরো তীব্র আবেগ তৈরি করবে, তাদের স্বাধীনতার আন্দোলন বলবান হবে এবং উপযুক্ত বিবেচনাপ্রসূত সঠিক নেতৃত্বের জন্ম দেবে। যদিও পূর্ণাঙ্গ কাশ্মীরের তিন ভূখণ্ড তিন বলশালী রাষ্ট্র–ভারত, পাকিস্তান ও চীন–এই তিনভাগের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকার কারণে কাশ্মীরের সমস্যা সব সময়ই আন্তর্জাতিক চেহারা নিয়েছে। এই কারণে সেই আন্দোলন যথেষ্ট কঠিন। তিন রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থের টানাপোড়েনের মধ্যে কাশ্মীরিদের পক্ষে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান নির্মাণ করা যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্ট করে এসেছে এবং এখনো করবে তাতে সন্দেহ নেই। তবু, তার মধ্যেও মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কোনদিন অপমৃত্যু ঘটতে পারে না, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।